Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 101-110
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0730

নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা* : উনিশ শতকের নারী জীবনের দাহনযন্ত্রণা
[Nistarini Devi's *Sekele Kotha*: The Agony of Women's Lives in the 19th Century]

মনোরমা ইসলাম*

Abstract

The 19th century is quite significant in reviewing the history of the progress of Bengali women in undivided India. The caste system, the practice of Sati, the practice of child marriage, the practice of male polygamy, illiteracy, superstition, the dominance of feudal values, and the indifference of society and family towards women's education were the characteristics of that era. However, through the introduction of education and various social reform programs, Indian social reformers tried to enlighten the women of Bengal. This article pays special attention to the statements made by women about their own social status about themselves and other women in their own eyes. Although most of the Bengali uneducated women at this time were less aware of themselves. However, there were some women who opened up about their situation and expressed some things in their memoirs. Which were later published. Nistarini Devi is one such woman, whose memoirs were published under the name 'Sekele Katha'. Here she talked about her personal life, experiences and various issues of society. Sometimes she also expressed her opinions on various customs of society. In this article, I have tried to shed light on the harsh reality of Nistarini Devi's own life, the position of women in 19th century Bengal, social evils and the role of social reformers with the help of her memoirs. I have highlighted the social context of the time by showing the reactions of other contemporary Bengali women in these discussions. The main purpose of this article is to raise and explain these issues.

Keyword: Nineteenth century, Bengali women, Nistarini Devi, Social evils, Consciousness.

উনিশ শতকীয় সমাজে বাস করে নিজের অবস্থান সম্পর্কে স্মৃতিকথা বর্ণনায় অনন্য এক নাম নিস্তারিণী দেবী (১৮২৫-১৯১৫)। তিনি তৎকালীন কুলীন প্রথার শিকার একজন বাল্যবিধবা ছিলেন। বাঙালি সমাজে বিধবা নারীর যন্ত্রণার ইতিহাস বহু পুরনো। এই সমাজে বিধবাদের জীবনের পরিণতি অত্যন্ত করুণ ছিলো। আর সন্তানহীন বিধবাদের জীবন ছিলো আরোও মর্মান্তিক। এককালে এইসব নারীদের ভবিতব্যই ছিলো নিরুপায় হয়ে বৃন্দাবন বা কাশীবাস নয়তো স্বামী বা পিতৃগৃহে সারাজীবন ধরে বিধবার কর্তব্য করে যাওয়া। আর নাহলে নিজের ভাই বা কোনো নিকট আত্মীয়ের গৃহের কোণে 'বালাই' হয়ে পড়ে থাকা। *সেকেলে কথা*র নিস্তারিণী দেবীর জীবন-বাস্তবতাও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। তাঁর জীবনের গল্প ঠিক যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের 'বল্লালী বলাই' পর্বের কালজয়ী চরিত্র ইন্দির ঠাকরুনের মতোই। নিস্তারিণী দেবী শেষ বয়সে কুলীন-প্রথার ভয়াবহতা ও নারীর পরাধীন জীবনযাপনের পরিণতি নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'অবিকল তদ্রূপ' লিখে গিয়েছিলেন, যা *ভারতবর্ষ* পত্রিকার ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়'সেকেলে কথা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[১]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ;
ই-মেইলঃ monoramaislam22@ru.ac.bd

নিস্তারিণী দেবী কুলীন বংশের মেয়ে হওয়ায় তাঁর ৯/১০ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো প্রায় ত্রিশটি বিবাহ সম্পন্নকারী পঁচিশ বছরের এক যুবকের সাথে। নিস্তারিণী দেবীর স্বামী যখন প্রয়াত হন, তখন তিনি ছিলেন মাত্র চৌদ্দ বছরের কিশোরী। পরবর্তী জীবনের বাকি ৭৬ বছর তিনি বৈধব্য পালন করেছিলেন। বিবাহের পর থেকে কোনোদিন তিনি শ্বশুরবাড়িতে না যাওয়ায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ভাইদের সংসারে জীবন অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে তিনি কাশিতে প্রয়াত হন। জীবিত অবস্থায় তিনি পিতার সংসার কিংবা ভাইদের সংসারে কখনো আদর পাননি, হয়েছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের সংসারে অমানুষিক পরিশ্রম করার পরেও তাদের কাছে অনাদর, দুর্ব্যবহার, যন্ত্রণা ও কষ্ট পেয়েছেন। এইসব কষ্টের বর্ণনা নিস্তারিণী দেবী অবলীলায় বলেছেন *সেকেলে কথায়*। যা পরবর্তীতে ২০১১ সালে *সেকেলে কথা* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। উনিশ শতকের নারীদের জন্য আত্মকথা রচনা যেমন দুরূহ ছিলো তেমন ছিলো অবিশ্বাস্য। কারণ সেই সময় তাঁদের প্রধান পরিচয় ছিলো অন্তঃপুরবাসিনী। তা সত্ত্বেও বাংলার প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা ছিলেন রাসসুন্দরী দেবী (১৮১০-১৮৯৯)। উনার জন্ম উনিশ শতকের প্রথম লগ্নে। সেকালের বাঙালি মহিলাদের চিত্র পুনর্নির্মাণের জন্যে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী রীতিমতো অমূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।[২] উনি ছাড়াও আরোও অনেককেই আত্মকথা রচনাকার হিসেবে পাওয়া যায়। সারদাসুন্দরী দেবী, শ্রীমতি কৈলাসবাসিনী, সুদক্ষিণা সেন প্রমুখ একেবারেই প্রথম দিককার আত্মকথা রচয়িতা এবং তাঁদের রচিত আত্মকথা বা স্মৃতিকথায় বঙ্গনারীদের নিজস্ব স্বর ও নিজস্ব ভাবনার কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও এইসময় নারীদের জীবন ও সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে তাঁরা নিজেরা, তাঁদের পরিবার এবং তৎকালীন সমাজসংস্কারকদের মনোভাব ও পদক্ষেপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এইসব ধারণার প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের নারীর জীবনবাস্তবতা ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছিলো কি না তাও অনুধাবন সম্ভব হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে এই প্রবন্ধে নিস্তারিণী দেবীর সমসাময়িক সমাজ, দেশাচার, নারীর জীবনযাপনে প্রতিনিয়ত সমাজের প্রতিবন্ধকতার চিত্র অনুসন্ধান করা হলো।

*সেকেলে কথা*গ্রন্থে তাঁর স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেকালের নারীজীবনের কঠিন বাস্তবতা। তৎকালীন সমাজের দেশাচারের নামে বিভিন্ন প্রচলিত কুপ্রথার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কেও জানা যায়। সেইসব কুপ্রথার মধ্যে ছিলো কৌলিন্যপ্রথা, যার প্রভাব নারীর জীবনে এনেছিলো অভিশাপ আর কুলীন পুরুষের জীবনে নানা সুযোগ-সুবিধা। এই প্রথা অনুযায়ী কন্যা ঋতুমতি হওয়ার আগে বিবাহ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ও বিবাহ দিতে না পারলে পিতামাতার যে সামাজিক অসম্মান হতো তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের বিবাহ করতো। নিস্তারিণী দেবীর বর্ণনা থেকে বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। নিস্তারিণী দেবী বলেছেন:

> ...আমার বার বছর বয়স হল: ...কুলীনের মেয়ের যেমন নিয়ম, কাজেই বিয়ে হতে দেরী হয়েছে। আমার ঠাকুরমাকে আনা হইয়াছে; তিনি দিনরাত আমায় বকতেন। আমি যেন সকলের চক্ষের শূল। বাবা সর্বদাই শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তেন, 'নিস্তারের বিয়ে দিতে এতগুলি টাকা খরচ হবে।' ...দাদা বল্‌তেন, 'অনেক টাকা দেনা করে দেশে পাঠাতে হবে।'[৩]

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মানো নারীরা পরিবারের কাছে কতোটা বোঝা হয়ে উঠতো। অন্যদিকে কুলীন ব্রাহ্মণ এইসব কন্যাদের পাণিগ্রহণ করে নানাভাবে আর্থিক ও জীবনধারণে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। কৌলিন্য প্রথার নামে বিবাহ করাটা ঐসময় লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিলো। এই প্রথায় বিবাহের পর কন্যাকে কখনো কখনো শ্বশুরবাড়ি নিলেও বেশিরভাগ সময়ই নেওয়া হতো না। এমনকি ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধের কাছেও নির্দ্বিধায় কন্যাদান করতো কিংবা একই পাত্রের কাছে

একাধিক কন্যাদান করতো। কন্যার পিতাগণ কন্যার 'আইবুড়ো নাম-খণ্ডন' ও 'কুলরক্ষা' নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকতো। ফলে কুল রক্ষার এই প্রথা সমাজে আরোও একটি সমস্যা তৈরি করে তা হলো পুরুষের বহুবিবাহ। এই বহুবিবাহও তখন সমাজে বেশ স্বীকৃতি পেয়েছিলো। নিস্তারিণী দেবীর বর্ণনাতেও বহুবিবাহকে খুব স্বাভাবিক বলেই প্রকাশ করা হয়। কারণ, নিস্তারিণী দেবীর বৃদ্ধপিতামহের ১০৮টি, পিতামহ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫৪টি ও পিতা হরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই স্ত্রী ছিলো। তাঁর ভাষ্যমতে: 'তখন যে যত বিবাহ করিতে পারিত সে তত ভাল কুলীন বলিয়া জনসমাজে বিদিত থাকিত, এখনকার ছেলেরা একটি পরিবারকে খাইতে দিতে পারে না, গলার বোঝা মনে করে; তখনকার পুরুষেরা শত পরিবারের পিতামাতার নিকট হইতে নিজের খরচ চালাইয়া লইত।'[৪]

সেকেলে কথা'য় নিস্তারিণী দেবীর পিতার বিয়েসংক্রান্ত স্মৃতিচারণে কৌলিন্যপ্রথার ভয়াবহতা ও পাত্রের পরিবারের দাবিকৃত মূল্য পরিশোধে পাত্রীপক্ষের অপারগতার জন্য নানাভাবে হেনস্থা হওয়ার চিত্রও প্রতিফলিত। হরচরণের প্রথম স্ত্রী ক্ষেত্রমণিকে বিবাহের সময় যে চুক্তি হয় তা পাত্রীপক্ষ দিতে পারে না। ক্ষেত্রমণি যখন সামান্য গহনা দিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করতে যায় তখন হরচরণের পিতা রাগে ঐ সামান্য গয়না কাপড়ে বেঁধে ছেলেকে নিয়ে পাত্রীর বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। মদনমোহন সামান্য গয়না পেয়েছে বলে রাগ করে ছেলেকে জানায় যে তার আরোও কিছু প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক অংশ: হরচরণ বাবার মনের দুঃখ দেখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'এতে হ'ল না বাবা! মনে তুমি কিছু কর না। মাকে কিছু ব'ল না; চল আমি আর একটা বিয়ে ক'রে তোমাকে কিছু এনে দিই।'[৫]

হরচরণ দ্বিতীয় বিয়ে অনেক পিতার সাথে যুক্তিবুদ্ধি করে নিজে ঘরজামাই থাকার শর্তে ও জমিদার শ্বশুরের কাছ থেকে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে দারোগার চাকুরির বিনিময়ে করে। হরচরণ পরবর্তীকালে নিজের কন্যা নিস্তারিণী দেবীকে বিয়ে দিতে গিয়ে এই জটিলতার মধ্যে পড়ে। নিস্তারিণী দেবীর যে পাত্রের সাথে বিয়ে ঠিক হয় সে গরীব কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলো এবং কন্যার পিতার কাছ থেকে নিজের ও পিতার সংসার চালানোর জন্য মাসোহারা নিয়ে বিয়ে করতো। এইভাবে মাত্র ২৫ বছর বয়সে সে প্রায় ত্রিশটি বিয়ে করে এবং কখনো কখনো একই পরিবারের তিন বা চারজন কন্যাকে একইসাথে বিয়ে করতো। নিস্তারিণী দেবীর বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছিলো পাত্রের বাবাকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে দেওয়ার চুক্তিতে। পরবর্তীতে এই টাকা না পাঠানো হলে নিস্তারিণী দেবীর শ্বশুর ছেলেকে নিস্তারিণীর পিতার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ করে চিঠি পাঠায়। এরপর থেকে নিয়মিত পাঁচটাকা পাঠানো হতো। অথচ নিস্তারিণী দেবী বিয়ের পর কখনো শ্বশুরবাড়ি কিংবা স্বামী-সংসার-সন্তান কিছুরই স্বাদ পায়নি। শুধু সারাজীবন বাবা-দাদার সংসারে গলগ্রহ হয়ে থেকেছে আর মাসে মাসে শ্বশুরবাড়িতে পাঁচ টাকা পাঠাবার খেসারত দিয়েছে। পক্ষান্তরে নিস্তারিণী দেবী স্বামীকে ভক্তি করে 'তিনি' সম্বোধন করতেন। নিস্তারিণী দেবীর ভাষ্যমতে, এই 'তিনি' হলো ভগবানের মতো সম্মাননীয়।[৬] নিস্তারিণী দেবীর স্বামী ঈশ্বরচন্দ্র নিস্তারিণী ছাড়াও কিছু আদায়ের আশায় অন্য স্ত্রীদের বাসায় পালাক্রমে যেতো। স্বামীভোগ জীবনে না থাকা কিংবা অল্প বয়সে বিধবা হওয়া এবং ভাই ও ভাইপোদের সংসারে অবহেলিত, অপমানিত, অত্যাচারিত হয়ে জীবনযাপন নিয়ে নিস্তারিণী দেবীর কোনো আক্ষেপ ছিলো না। নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথায়* বর্ণিত তার জীবনের দুঃখদৈন্যকে ভাগ্যের দোহাই দিয়েই মেনে নিয়েছিলেন।

নিস্তারিণী দেবীর জীবনের ঘটনা থেকেই তৎকালীন নারীদের বিয়ে ও অকাল বৈধব্যের মর্মান্তিক দিকটি প্রকটিত। অকাল বৈধব্যের কারণে তৎকালীন নারীরা মর্যাদাহীন জীবনযাপন এবং অসহায়, অনাথ অবস্থায় শত শত আচার কুসংস্কারের কারাগারে বন্দি হয়ে কাটাতে হতো। তাদের বাকি জীবনটুকু

শুধুমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই ও দু'মুঠো অন্নের জন্য আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে ঘুরে আশ্রয় ভিক্ষা চাইতে হতো। অমানবিক এক বর্বর- প্রথার শিকার হয়ে জীবনের ভার বহন করতো তারা। তাদের জীবনে প্রতিপদের গঞ্জনা নিত্যদিনের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সেইসব মেনে নিতে হতো। সেকালে একটা ছড়া প্রচলিত ছিলো, 'লাথি ঝাঁটা পায়ের তল, ভাত কাপড়টা বুকের বল'। সেইসময়ের অনেকের তথা প্রসন্নময়ী দেবী, আমোদিনী দাশগুপ্ত, আশালতা সেন, প্রতিমা দেবী প্রমুখের নিজের জীবনের স্মৃতিচারণমূলক লেখায় বিষয়গুলোর সত্যতা পাওয়া যায়। তাদের লেখায় এইসব সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করতে দেখা যায়। তবে নিস্তারিণী দেবীর সাবলীলভঙ্গিতে বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনো অভিযোগ, অনুযোগ কিংবা প্রতিবাদস্বরূপ কোনো বক্তব্য প্রকাশ পায়নি। বরং স্বামীর মৃত্যুর পর নিস্তারিণী দেবী যে মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে পেয়েছে তার জন্য নিজেকে 'ভাগ্যবতী' ভাবে এবং তাঁর সতীনদের যারা খবর পায়নি তারা মাছ-ভাত খেয়ে পাপ করেছে বলে তাঁর মনে হয়। সেইসব নারীরা নিজেদের পাপী ভাবতে দ্বিধা করেনি, বরং কুলীনদের বহুবিবাহ ও শ্বশুরবাড়িতে সেইসব ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে **১৮১৯** খ্রিস্টাব্দে 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' শীর্ষক পুস্তিকায় রামমোহন রায় লিখেছিলেন: "যাঁরা বহুবিবাহ করেন, বিবাহের পর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীর 'অনেকের সহিত সাক্ষাৎ' হওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে। এতৎসত্ত্বেও এইসব স্ত্রীরা স্বামীর দ্বারা কোনওরকম 'উপকার' প্রাপ্তি ব্যতিরেকেও পিতার বা ভাইয়ের সংসারে 'পরাধীন' জীবনযাপনের মাধ্যমে 'ধর্ম নির্বাহ'করেন।"[৭] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাতেও এই সম্পর্কিত লেখা পাওয়া যায়। এই কথাগুলো আসলে নিস্তারিণী দেবীর মতো অসংখ্য কুলীন নারীকে স্মরণ করে লেখা। প্রাসঙ্গিক উক্তিটি:

> স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিতা হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহকর্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিত দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববৃদ্ধি করেন, এইমাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের ভারবহন করিতে হইবেক না। সুতরাং কুলীনমহিলারা, নামে মাত্র বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কালযাপন করেন। স্বামিসহবাস-সৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই...[৮]

নারীকে 'আপনভাগ্য' জয় করার অধিকার সেইসময় ধর্ম, সমাজ কিংবা পরিবার কেউই দেয়নি। তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও তার অন্ধ অনুসারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে উপযুক্ত মানবিক মর্যাদা প্রদানে বরাবরই কপট থেকেছে। ফলে সমাজের সৃষ্ট নিয়মের বেড়াজালে তৎকালীন নারীরাও অবহেলিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। সমাজ যেমন তাদের অবস্থান নিয়ে কঠোর রক্ষণশীল ছিলো তেমন পারিবারিকভাবেও তাদের অবহেলার পাত্রী হিসেবে দেখা হতো।

নারী সম্পর্কে বাঙালির পারিবারিক রক্ষণশীলতার অন্য একটি অভিব্যক্তি হলো নারীকে সেবিকারূপে দেখা। এই ধারণার প্রেক্ষিতে নারী হবে স্বামীনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণা, গৃহরক্ষয়িত্রী এবং সন্তানের জন্যসর্বস্ব উৎসর্গ করা জননী।[৯] এই চেতনা নারীর মধ্যে শিশুকাল থেকে বপন করা হতো। ফলস্বরূপ, তারা শ্রেণিগত অবস্থান, কালিক সীমাবদ্ধতা ও পারিবারিক অবহেলার নিগড়ে নিজেদের দাসী ভাবতে শুরু করে। নিস্তারিণী দেবীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিস্তারিণী দেবীর নিজের জীবনকথা বর্ণনায় দেখা যায়, নিস্তারিণী দেবীর পরিবারের পুরুষেরা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজের আরোপিত প্রথার বাইরে অবস্থান যেমন নেয়নি তেমন নিস্তারিণী দেবীকে পড়ালেখা শেখানো কিংবা আত্মসম্মানের সাথে বেঁচে থাকার উপায় করে দেওয়া বা সুযোগ দেওয়ার কোনো আলামত পাওয়া যায় না।[১০] তিনি ৭৬ বছরের

বৈধব্যজীবনে কখনো নিজের জন্য বাঁচেননি। প্রথম অবস্থায় পিতার সংসারে ও পরবর্তীকালে ভাই ও ভাইপোদের সংসারে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে জীবনধারণ করেছেন। নিস্তারিণী দেবীর ক্ষেত্রে মনুসংহিতার শ্লোকটি স্মরণযোগ্য: 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/ রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥' অর্থাৎ, নারীকে পিতা কুমারী বয়সে, স্বামী যৌবনে এবং পুত্র বার্ধক্যে রক্ষা করবে। নারী কখনো স্বাধীনতার যোগ্য নয়।[১১] নারীর স্বাধীনতাভোগ কিংবা ভাগ্যকে জয় করার প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিলো নারীর প্রতি নারীর অবহেলা। এমন প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছিলেন নিস্তারিণী দেবী। বাল্যবিধবা ও নিঃসন্তান হওয়ায় তার আশ্রয় হয়ে ওঠে দাদা-বৌদিদের সংসার। অন্যের সংসারে থাকার কারণে সবসময়ই তাকে উপেক্ষিত থাকতে হয়েছে এবং অবজ্ঞা-অবহেলার পাত্রী হিসেবেই থেকেছেন বরাবর। তার নিজের জীবন নিয়ে তার করুণ বর্ণনা:

> বাবা কারও চিরদিন থাকে না, স্বামীও চিরদিন বেঁচে থাকেন না; কিন্তু ছেলেবেলায় বাপ-ম'রে যাওয়া বড় কষ্টের! স্বামী কেমন দেখ্লুম না, স্বামী স্বর্গে গেলেন। এ সকল দেখে শুনে, যে মরণ-বাঁচন তৈয়ার করেছে, তাকে গাল দিতে ইচ্ছা কর্ত। আমরা, সংসারে জড়িয়ে পড়লে, মরণকে ভয় করি, কিন্তু, সংসার আরম্ভ না ক'রে, মরণের দাগা পাওয়া বড় কষ্ট। আমি বিধবা হ্লুম; আমার দুঃখের আরম্ভ হ'ল।[১২]

বাবা-স্বামীর অবর্তমানে তিনি দাদাদের সংসারে হাল ধরেছিলেন। তাদের সংসারে রান্না, ভাইপোদের লালন-পালন করা ছিলো নিত্যদিনের সঙ্গী। নিঃসন্তান হওয়ায় ভাইপোদের প্রতি মাতৃস্নেহ অনুভব করতেন ভীষণ। নারীর এই স্নেহশীল হৃদয়ই নারীকে প্রতিকূল জীবনে যোদ্ধা করে তোলে। তিনি দাদাবৌদির সংসারে তাই অনেক উপেক্ষাসহ্য করেছেন। তার ব্যক্ত স্মৃতিকথার প্রতিটি উচ্চারণই তার জীবনের চরম ভয়াবহ নিয়তির সাক্ষী। প্রাসঙ্গিক উক্তি: 'বউ কুটোটাও নাড়ুত না। একাদশীর উপবাস ক'রে, কায কর্তে হ'ত। আমার জ্বর হ'ল, ...। সত্যই দাদা বলেছিলেন, বিধবার ব্যারাম আবার কি? তাই, কি করি?ম'রে ম'রে রাঁধি, আর কাঁদি। ...।'[১৩] নিজের পরিবারের কাছের মানুষও মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে বৈধব্য জীবনের দুঃসহতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতো তা নিস্তারিণী দেবীর দাদার এই অমানবিক উক্তিতে স্পষ্ট।

নিস্তারিণী দেবীর ছিলো তিন ভাই। তারা হলেন– দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবীচরণের পর ছিলেননিস্তারিণী দেবী। দেবীচরণের আবার তিনপুত্র– হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভবানীচরণই ছিলেন 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়'। নিস্তারিণী দেবী স্মৃতিচারণে বারবার ভাইপো ভবানীচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনীকার ও অন্যান্য লেখক কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মবান্ধব কাকাদের নাম উল্লেখ করলেও তাঁর কোনো লেখায় পিসি নিস্তারিণী দেবীর কথা বলেননি। এই থেকে বোঝা যায় নিস্তারিণী দেবী সংসারে কিংবা আপনজনদের কাছে ভীষণ উপেক্ষিত ছিলেন। আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো– নিস্তারিণী দেবীর পরিবারে পুরুষেরা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিস্তারিণী দেবী প্রথাগত শিক্ষা কখনো গ্রহণ করেননি। শিক্ষিত না হওয়ার আফসোস তাঁর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। সন্তানকে পড়ানোর জন্য হলেও স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজন সেটা তিনি স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। নিস্তারিণী দেবীর শিক্ষিত না হওয়ার পেছনে পরিবারের অবহেলা ছাড়া আর কোনো কারণ নেই– এটা বোঝা যাচ্ছে। সমসাময়িক হিন্দু সমাজ মেয়েদের যে কেবলমাত্র একটি বোঝার অধিক কিছু মনে করতো না সে সম্পর্কে সচেতন নিস্তারিণী দেবী অন্য সমাজের মেয়েদের পারিবারিক সচেতন থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে আফসোস করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ: 'মেয়ের খাতির সত্যি সত্যি যে জাত করে, সে জাতের মেয়ের ঘরে বিয়ে কর্ত্তে বর আসে। যাদের গির্জ্জায় বিয়ে হয় তারা মেয়ে ছেলে সমান দেখে। আমাদের নৌকাতেই মেয়ে

নিয়ে মেয়ের বাপ মা চল্লো।'[১৪] নিজ পরিবার ও সমাজ দ্বারা অপমানিত, লাঞ্ছিত জীবনযাপন করার বিষয়টি নিয়ে হিন্দু সমাজে কোনো দ্বিধা কিংবা সমাধানের উদ্যোগ ছিলো না। উপরন্তু অন্য ধর্মের কিংবা সমাজের মানুষ দ্বারা স্পর্শ হলেও সে মেয়েকে তারা নিজেদের জাত থেকে বের করে দিতো। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের একটি কাহিনি বর্ণনা করে নিস্তারিণী দেবী সমাজের এই করুণ দিকটি উন্মোচন করেন। প্রাসঙ্গিক ঘটনা:

> আমার বেশ মনে পড়ে, সিপাইদের যখন লড়াই হয়, তখন সিপাইদের এক মেয়ের বাপ, পাছে মেয়ে বিধর্মীর হাতে অপমানিত হয়, এই ভেবে তার মেয়েটিকে শুক্নো পাতকুয়ায় ফেলে পালিয়েছিল। সেই খোট্টার মেয়েকে এই "কাঁটালেদের" মহীন্দ্র ঘোষ, কুয়া থেকে হাত ধ'রে তোলে। সে মেয়েকে তারা আর জাতে নেয় না– শেষে, মহীন্দ্র ঘোষ সেই খোট্টাদের মেয়েকে বুড়োবয়সে বিয়ে করে। ...।
>
> ...
>
> তখন সমাজের ভিতরে থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে সব রকম স্বেচ্ছাচার চল্‌ত, ব'লে, এখনকার মত সমাজের বুকে ব'সে দাড়ী-উপড়াতে কেউ সাহস পেত না। তুমি লুকিয়ে উচ্ছন্ন যাও, তাতে সমাজ কিছু বলবে না। ...সমাজও সন্তানের দোষ গ্রহণ করে না। কিন্তু সমাজকে মান্‌ছে না, এ কথাটা বলা তখনকার কালে বড় কঠিন ছিল। সমাজ ত একজন লোক নিয়ে ছিল না। সমাজের দৃষ্টি ছিল– অনেক লোকের বিশুদ্ধি রাখা। সমাজের ব্যবস্থাও সবরকম লোকের উপযোগী ছিল।[১৫]

সমাজে নারীকে নিয়ে একটি প্রবাদ প্রচলন আছে– 'মেয়ের নাম ফেলী/পরে নিলেও গেলি/ যমে নিলেও গেলি'। পল্লিবাংলার প্রচলিত এই একটি মাত্র প্রবচনই উনিশ শতকের নারীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবারে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে যথেষ্ট। পরিবারের অভ্যন্তরে লিঙ্গ বিভাজনের ফলে দেখা যায় মেয়েরা মনস্তাত্ত্বিক কারণেই পুরুষের অধীনতা মেনে চলতে বাধ্য হয়। সমাজে পুত্রসন্তান বার্ধক্যের ভরসা, বংশরক্ষা ও চিতায় আগুন দেবার যে অধিকার পায় তার ফলে শৈশব থেকেই তাঁর মনে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। এই সম্পর্কিত একটি অভিমত– '...যথাপ্রাপ্ত লৈঙ্গিক অবস্থানের সূত্রে পুরুষ নিশ্ছিদ্রভাবে পীড়নকারী প্রভু আর নারী বিকল্পবিহীনভাবে নির্যাতিত ও অবদমিত।'[১৬] নারীপুরুষ মেয়েলি বা পুরুষালি গুণ নিয়ে জন্ম নেয় না। জন্মের পরে সমাজ-সংস্কৃতির চাপে তারা অর্জন করে মনোলৈঙ্গিক ব্যক্তিত্ব। সমালোচকের ভাষায়:

> লৈঙ্গিক রাজনীতি পুরুষ-নারী দু'লিঙ্গেরই সম্মতি আদায় করে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পিতৃতন্ত্র পুরুষ ও নারীর জন্যে যে মেজাজ, ভূমিকা ও অবস্থান স্থির করে, সামাজিকীরণের ফলে তা মেনে নেয় তারা। পুরুষই শ্রেষ্ঠ, এমনএকটি কু-সংস্কার বদ্ধমূল ক'রে তোলে পুরুষতন্ত্র, তাই অবস্থানগতভাবে পুরুষ পায় উচ্চ মর্যাদা, নারী পায় নিম্ন মর্যাদা। পুরুষ তা মেনে নেয় ও ভোগ করে তার জন্ম অধিকার ব'লে, আর নারীও তা বিশ্বাস ও স্বীকার করে।[১৭]

নিস্তারিণী দেবী সমাজের এইসব নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা সম্পর্কে বর্ণনা বা তির্যক মন্তব্য করেছিলেন কিন্তু মুক্তির জন্য কোনো পদক্ষেপ বা প্রতিবাদ করেননি। তবে সমসাময়িক সুদক্ষিণা দেবী (১৮৫৯-১৯৩৪) তাঁর *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে তাঁর মায়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যিনি কৌলিন্য-প্রথার ভয়াবহতা থেকে কন্যাদের জীবন মুক্ত করতে নিজে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাটি সেই সময় সাপেক্ষে ভীষণ সাহসী পদক্ষেপ। সমসাময়িক হিন্দু সমাজকে 'কারাগার' উপমায় উপমিত করে সেই কারাগার থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে। যা সুদক্ষিণা সেনের কাছে 'অন্ধকার কারাগার হইতে মুক্ত বাতাসে আসা'র সমান।[১৮] কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা করে শ্রীমতি কৈলাসবাসিনীও সরব

হতে দেখা গেছে। তিনি তাঁর *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*গ্রন্থে হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন– 'এই দেশাচারে বশীভূত হইয়া আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মাভিমানী মহোদয়গণ কি অপ্রিয় কার্য্যই না করিতেছেন। তাঁহারা বিষম কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষার্থে স্ব স্ব দুহিতাগণকে অতি শৈশবকালেই অযোগ্য পাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কতই শ্লাঘা প্রকাশ করেন।'[১৯] এই সকল কথার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের নারীর জীবনের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকীয় নারীদের রচনায় বিধবাবিবাহ নিয়েও নানা মত ও আক্ষেপ তাঁদের স্মৃতিচারণাতে দেখা যায়। কিন্তু নিস্তারিণী দেবী এই বিষয়ে তেমন কিছু বলেননি। রাসসুন্দরী দেবী ও সারদাসুন্দরী দেবী স্পষ্ট ভাষায় এইসব নিয়ে আক্ষেপ করেছেন নিজস্ব রচনার মধ্যে। রাসসুন্দরী যৌবনকালে নারীদের যে পরাধীন জীবন দেখেছিলেন তা ছিলো পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মতো। আর তাঁর বার্ধক্যকালের নারীজীবনে যে পরিবর্তন দেখেছিলেন তা হলো নারীদের পরণপরিচ্ছদে (মোটা মোটা কাপড়, ভারী ভারী গহনা, হাত ভরা পলা শাঁখা) এবং চালচলনে সামান্য সংকোচের লোপ। তা দেখেই তিনি বৃদ্ধবয়সে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন: 'এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন/ পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন।'[২০] তিনি এই কথা ১৮৭০-১৮৭৩ এর দিকে বলেছিলেন। রাসসুন্দরী গ্রামের এই সামান্য নারীজীবনের পরিবর্তন দেখেই নিজেদের সময়ের কথা ভেবে আফসোস করেছিলেন। অথচ কলকাতা নগরীর শিক্ষিতা ব্রাহ্ম এবং ইংরেজি শিক্ষিত পরিবারের মহিলাদের জন্য ততদিনে সামাজিক মর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিলো। অবশ্য তাঁর সামান্য হাওয়া লেগেছিলো গ্রামীণ শিক্ষিত কিছু হিন্দু পরিবারে। যেমন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী স্বামী ও পরিবার নিয়ে অথবা রামবাগানের দত্ত পরিবারের দুটি কন্যা তরু ও অরু ততোদিনে ইউরোপে চলে গেছেন লেখাপড়া শেখার জন্যে, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপে গেছেন তাঁকে আধুনিকা করে তোলার উদ্দেশ্যে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী একাধিকবার বোম্বাই ঘুরে এসেছেন এবং লাটভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণে গেছেন স্বামীকে ছাড়াই। কেশব সেন পরিচালিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা পর্দার বাইরে এসে সবার সঙ্গে একযোগে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারীদের স্বাধীনতার অন্যতম উৎসাহীকর্মী কেশব সেনকে ঠাট্টা করে প্রহসন লিখলেও নিজের স্ত্রীকে শেখাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়তে।[২১] এইসব ঘটনা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না আত্মজীবনী রচয়িতা নারীদের। শুধু তাই নয়, যেসব সামাজিক সমস্যার কথা তাঁদের আত্মকথায় স্থান পেয়েছে সেইসব নানাবিধ সমস্যা মুক্তি ও নারীর অবস্থান উন্নয়নার্থে আইন প্রণয়ন হয়েছিলো সেগুলো সম্পর্কে তারা নীরব ছিলেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কুলীন প্রথা, বিধবা সমস্যা বিষয়ক সমসময়ে আইন পাশ হয়েছিলো। বিশেষ করে পুরুষের বহুবিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ নিয়ে আইন প্রণয়নে বঙ্গসমাজে ভীষণ শোরগোল পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেইসব নিয়ে কোনো মন্তব্য, সম্মতি বা অসম্মতি কারো আত্মস্মৃতিতে বর্ণিত হয়নি, যা সত্যিই বিস্ময়কর। তবে এর একটা কারণ হতে পারে। সেটি হলো, বাইরের জগৎ, আইন-কানুন ইত্যাদিতে সেসকল মহিলারা যে চাইলেই বিচরণ করতে পারতেন না তা সহজেই অনুমেয়। একজন ব্যতিক্রম নারী আত্মকথক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১)। তিনি উনার মায়ের উৎসাহে এবং পিতার উদ্যোগে পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন এবং ছাত্রদের সাথেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা ঘটে।[২২] তবে আর কারোও ক্ষেত্রে এর প্রমাণ মেলে না। সমসাময়িক বঙ্গ সমাজে স্ত্রী শিক্ষার যে চিত্র অন্যান্য মহিলা আত্মজীবনীকারদের রচনায় পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগেও স্ত্রীশিক্ষা সমাজে সেই অর্থে মান্যতা পায়নি।

এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বঙ্গদেশে মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা পুরুষ ও স্থানভেদে মহিলার চেয়ে মহিলাতে অনেক পিছিয়ে থাকার কারণ তাদের শিক্ষার অভাব। যুগ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে

উনিশ শতকের মূলমন্ত্র ছিলো যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ। এর অনুষঙ্গ হিসেবে উদ্ভব হয়েছিলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, নরনারীর সম-মর্যাদা, স্বদেশচেতনা ও পুরাতনের নবমূল্যায়ন। বলা যায় এই নবমূল্যায়নের তাগিদে বাংলার রেনেসাঁসের পুরপিতারা সকলেই নবজাগ্রত বোধ ও ভাবকে তাঁদের জীবনে, কর্মে, সাহিত্যে ও শিল্পে স্ফুটোজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সেই সময় পিছিয়ে ছিলো। বলা যেতে পারে, নারী সমাজ শিক্ষার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিতই ছিলো।[২৩] ১৮১৭ সালে রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের চেষ্টা প্রবর্তিত হয়। তবে স্বতন্ত্রভাবে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে। এরপর রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু ও সমকালের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে উপহাস করেছিলো। প্রসঙ্গত শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে– 'এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।'[২৪] বাংলাভাষার কবি ঈশ্বরগুপ্ত স্ত্রীশিক্ষার ভবিষ্যৎবাণী করে বললেন:

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ বি শিখে বিবী সেজে, বিলাতী বোল করেই কবে;
আর কিছুদিন থাকবে ভাই!পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।[২৫]

১৮৫৭ সালে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহীতে প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম (১৮৫৭-১৯৩৯)। প্রসন্নময়ী যখন কিছুটা বয়সে বড় হন তখন তিনি স্মৃতিচারণায় তাঁর গ্রামের স্ত্রীশিক্ষার চমকপ্রদ বিবরণ দেন। তাঁর মতে: 'সে সময় তাঁর গ্রামের প্রায় সমস্ত মহিলা কেবল মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ করতে পারতেন তাই নয় তাঁরা নিজেদের নামও স্বাক্ষর করতে পারতেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষিতা ছিলেন কাশীশ্বরী নামক এক বিধবা তাঁর গৃহে একটি পাঠশালাও খুলেছিলেন যেখানে তিনি গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের সাথে গ্রামের বয়স্কা মহিলাদের জন্যও পৃথক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।'[২৬] সমযুগের তুলনায় নিস্তারিণী দেবী জীবনযাপন পিছিয়ে ছিলেন বলা যায়। কারণ তাঁর সমসাময়িক নারীদের বর্ণিত যেসব ঘটনা কিংবা স্মৃতিকথায় প্রবন্ধে আলোচিত হলো তা নিস্তারিণী দেবীর জীবনকালেই ঘটেছে। তবে শিক্ষাগ্রহণে কিংবা জীবনযাপনের পরিবর্তনে তিনি কোনো আইন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেননি। তাঁর পরিবারের কাউকে এই ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যিনি নিস্তারিণী দেবীর বড়দাদা দেবীচরণের ছোট ছেলে ছিলেন। তিনি একজন ধর্ম প্রচারক, প্রকাশক এবং ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকেও তাঁর পিসির বিষয়ে কোনো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না। বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। তবে উনিশ শতকে নারীকে তাঁর অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের প্রতি বঙ্গনারীদের অসীম কৃতজ্ঞতা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৪), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮), কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। যেমন, সতীদাহপ্রথা বিলোপের ব্যাপারে রামমোহন রায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবার বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহরোধ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে মুখ্যত বিদ্যাসাগর ও অন্যরা সামাজিক আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। ধর্মসভাপন্থী রাধাকান্ত দেবও কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। নারীমুক্তি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা এবং তার প্রায়োগিক অনুশীলনজাত সামাজিক আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী নেতৃবৃন্দ যেমন অকৃপণ সহযোগিতা করেছিলেন, তেমনই বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তি, জমিদার এমনকি ব্রিটিশ সরকারের অনেক প্রশাসনিক

কর্তারাও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছিলেন। তবুও সমসময়ে নারীমুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে করা সম্ভব হয়নি।

সময়ের সাথে সাথে নারীমুক্তি ও নারী শিক্ষার হাত ধরে নারীকে তার ভাগ্যজয়ের পথ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সমসময়ের খুব কম নারীরই ভাগ্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো সুপ্রসন্ন ছিলো। কারণ তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি শিক্ষিতা হয়ে একা সন্তানদের নিয়ে সেই সময়েই সুদূর ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। তাই বলে যে তিনি নারী হিসেবে প্রতিবন্ধকতার শিকার হননি, তা নয়। আবার আত্মকথা রচয়িতাদের ক্ষেত্রেও বহু প্রতিবন্ধকতা ছিলো। এইসব উপেক্ষা করে তাঁরা নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতা বলে গিয়েছেন বলেই সমাজবিদগণ নারীমুক্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং বাংলা সাহিত্যও নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতাসত্ত্বেও নারী দ্বারা রচিত কিংবা স্মৃতিচারণমূলক আত্মকথার গ্রন্থগুলো তাঁদের সাহসিকতার পরিচায়ক। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উনিশ শতকের জীবন-বাস্তবতা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতামত, নিজের অধিকার নিয়ে লিখে যাওয়া এবং নিজের অবস্থান বা অস্তিত্বকে জানান দেওয়া প্রকৃতঅর্থে সামাজিক সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ। নিস্তারিণী দেবী'র *সেকেলে কথা*-য় বর্ণিত যাবতীয় বিষয় উনিশ শতকের সমাজে বসবাসরত বিধবা নারী জীবনের দাহনযন্ত্রণার বাস্তবিক প্রতিচ্ছবি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ নিস্তারিণী দেবী, *সেকেলে কথা*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১০।
২ গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, ২য় মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৬।
৩ নিস্তারিণী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
৪ তদেব, পৃ. ৩০।
৫ তদেব, পৃ. ৩৫।
৬ তদেব, পৃ. ৪৭।
৭ রামমোহন রায়, *রামমোহন রায় রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২০২।
৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৪।
৯ সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাস বহুরূপে*, ১ম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১১৫।
১০ নিস্তারিণী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।
১১ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, ৫ম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৪৮।
১২ নিস্তারিণী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।
১৩ তদেব, পৃ. ৬০।
১৪ তদেব, পৃ. ৪৫।
১৫ তদেব, পৃ. ৫১-৫২।
১৬ তপোধীর ভট্টাচার্য, *নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২৬।
১৭ হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৭।
১৮ সুদক্ষিণা সেন, *জীবনস্মৃতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭।
১৯ শ্রীমতি কৈলাসবাসিনী, *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলকাতা, ১৭৮৫ শক, পৃ. ১।
২০ শ্রীমতি রাসসুন্দরী, *আমার জীবন*, ১ম সংস্করণ, সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত, কলকাতা, ১২৮৩, পৃ. ৩১।
২১ Golam Murshid, *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization*, Sahitya Samsad, Rajshahi University, 1983, chapter 2 & 3.
২২ শ্রীমতি জ্ঞানদানন্দিনী, *পুরাতনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬।

[২৩] তপন মণ্ডল, "উনিশ শতক : নারী প্রগতির পথে স্ত্রীশিক্ষা"। *বাংলা রাজবংশী অসমীয়া সাহিত্যে নারীর ভাষ্য*, বিশ্বজিৎ রায় ময়ূরাক্ষী নাথ কৃষ্ণকান্ত রায় (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৬৬।

[২৪] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ৪র্থ মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭২-১৭৩।

[২৫] তদেব, পৃ. ১৭৩।

[২৬] Srabashi Ghos, "Birds in a cage: Changes in Bengali Social Life as recorded in Autobiographies by Women," *Economic and Political Weekly*, vol.xxi, NO. 43, 1986, p- 91.